এই লেখাটি "দি ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিষ্ট" এর ৮ম সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল।

শিশুর উপর পারিবারিক জীবনের প্রভাব

সাদিয়া শারমিন ঊর্মি
চিকিৎসা মনোবিজ্ঞানী

একটি শিশু যখন একটি পরিবারে জন্ম গ্রহণ করে তখন তাকে নিয়ে শুরু হয় নানা জল্পনা-কল্পনা। এই শিশুটিকে নিয়ে তাদের স্বপ্ন থাকে, কিভাবে তাকে মানুষ করবে ও বড় হয়ে সে কী করবে তার নিজের জন্য ও পরিবারের জন্য ইত্যাদি।

শিশুটি জন্মের পর থেকে সে তার পরিবার ও পরিজনদের মধ্যে বেড়ে উঠতে থাকে। তার কাছের ও চারপাশের মানুষ এবং পরিবেশ থেকে সে নানা বিষয় শিখতে শুরু করে। এই পরিবারের পরিমণ্ডল থেকে শিশু ভাল কিছু শিখতে পারে আবার মন্দ কিছুও শিখতে পারে। বিস্তারিত বললে বিষয়টা সবার কাছে পরিষ্কার হয়ে উঠবে।

প্রথমেই বলা যায়, বাবা-মার সঙ্গে শিশুটির সম্পর্ক যদি যথেষ্ট সুদৃঢ় ও নিবিড় না হয় তবে বাচ্চার মধ্যে এক ধরনের অস্থিরতা তৈরি হয়, কিংবা হতে পারে মা-বাবা ঘরের ও বাইরের কাজে ব্যস্ত থাকছেন ফলে ঠিকমত বাচ্চাকে দেখাশুনা করতে পারছেন না, এর ফলে হতে পারে বাচ্চার মধ্যে নিরাপত্তাহীনতার বোধ (insecurity feeling), অস্থিরতা (anxiety), বঞ্চিত হবার বোধ ইত্যাদি তৈরি হয়। এছাড়াও দেখা গেছে যে মা ও বাবা যদি বাইরের কাজে বেশী ব্যস্ত থাকেন তথা বাসায় পর্যাপ্ত সময় না দেন বা চাকুরীর জন্য অন্যস্থানে থাকেন, তবে বাচ্চার মধ্যে হতাশাবোধ সৃষ্টি হয় এবং নানা রকম মানসিক সমস্যার উৎপত্তি হয়ে থাকে।

বাবা-মার মধ্যকার সম্পর্ক কেমন সেটাও বাচ্চার উপর প্রভাব ফেলে থাকে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, বাবা-মার মধ্যে সবসময় ঝগড়াঝাটি লেগে থাকলে তার নেতিবাচক প্রভাব বাচ্চার উপর পড়ে থাকে। গবেষণার মাধ্যমে দেখা গেছে যে, এর ফলে বাচ্চার মধ্যে হতাশা, হীণমন্যতাসহ বিবিধ নেতিবাচক অনুভূতির সৃষ্টি হয়। বাবা-মার মধ্যকার এ ধরনের সম্পর্কের জন্য বাচ্চার মধ্যে মারামারি, ঝগড়া-বিবাদ ও ভাংচুর করার প্রবণতাও দেখা যায়।

বাবা-মার শিশু প্রতিপালনের ধরনও শিশুর আচার-আচরণের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করে। শিশু প্রতিপালন বা অভিভাবকত্বের এই ধরনকে মনোবিজ্ঞানীরা চারটি ভাগে আলোচনা করেছেন। যথা :

- ভারসাম্যপূর্ণ (Authoritative)
- কড়া শাসনকারী (Authoritarian)
- অসহযোগিতাপূর্ণ (Permissive/indulgent)এবং
- বঞ্চিত/অসংযুক্ত (Neglectful/uninvolved)

যে সব বাবা-মা বাচ্চাকে সঠিক সময়ে সঠিক উপায়ে শাসন করেন, আবার প্রয়োজনে পর্যাপ্ত সহযোগিতা ও আদরও করেন, তারা শিশু প্রতিপালনের ক্ষেত্রে ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থা রক্ষা করে চলেন। এ ধরনের বাবা মায়েদের বাচ্চারা আত্মবিশ্বাসী, সহযোগিতাপূর্ণ, দায়িত্বশীল হয়ে থাকে (বামরিন্দ্র, ১৯৭৫, ১৯৯৩; ইমারি ও কিটজম্যান, ১৯৯৫)।

যেসব বাবা-মা বাচ্চাদেরকে খুবই কড়া শাসনে রাখেন কিন্তু সহযোগিতা ও আদর করেন, তাদের বাচ্চাদের মধ্যে দ্বিধাদ্বন্দ্ব, অস্থিরতা এবং গাম্ভীর্য দেখা যায় (বামরিন্দ্র, ১৯৭৫, ১৯৯৩)। যেসব বাবা মায়েরা বাচ্চাদেরকে মারধোর করেন সেসব বাচ্চারা আক্রমনাত্মক হয়, মারামারি ভাংচুর করে থাকে (ইমারি ও কিটর্জম্যান, ১৯৯৫)।

যেসব বাবা মায়েরা তাদের বাচ্চাদের লালন-পালনের ক্ষেত্রে উদাসিন ও অসহযোগিতাপূর্ণ আচরণ করে থাকেন তাদের বাচ্চাদের মধ্যে আক্রমনাত্মক আচরণ, অস্থিরতা ইত্যাদি দেখা যায় (ওলউআস, ১৯৯৩)।

ছোটবেলা থেকেই যেসব বাচ্চার সঙ্গে তাদের বাবা-মায়ের নিবিড় ও স্থিতিশীল সম্পর্ক থাকে না, আবার তারা কখনো খুব কড়া শাসন করেন আবার কখন শাসনই করেন না, এ ধরনের শিশুদের মধ্যে আত্ম-নিয়ন্ত্রণের ও আত্মবিশ্বাসের অভাব, অদক্ষ আচরণ, বন্ধুদের সঙ্গে ও পড়ালেখায় সমস্যা দেখা যায় (হেনরিংটন ও পার্ক, ১৯৯৩)।

এরপর আসা যাক ভাই-বোনদের মধ্যকার সম্পর্কের বিষয়টি কিভাবে শিশুর উপর প্রভাব ফেলে সে আলোচনায়। শিশুর অন্যান্য ভাইবোনদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক ভাল থাকলে, একে অপরকে সাহায্য সহযোগিতা করে থাকে এবং শিশুও সহযোগিতামূলক মনোভাবাপন্ন হয়ে ওঠে। পক্ষান্তরে, বড় ভাই-বোনদের মধ্যে ধ্বংসাত্মক ও আক্রমনাত্মক আচরণ পরিলক্ষিত হলে, ঐ বাচ্চার মধ্যে ঐ ধরনের আচরণ সৃষ্টি হয়ে থাকে। এছাড়াও দেখা গেছে যে ভাইবোনের সংখ্যা বেশি হলেও অনেক ক্ষেত্রে সমস্যা দেখা দিতে পারে; একজনের সঙ্গে আরেকজনের মন কষাকষি, রাগারাগি, মারামারি প্রায় সব সময়ই লেগে থাকে।

পরিবারের মধ্যে অপর্যাপ্ত শৃঙ্খলা, অপর্যাপ্ত উৎসাহ প্রদান, অসহযোগিতাপূর্ণ আচরণ বা খুব বেশি মাত্রায় সবকিছুতে নিযুক্তি/খবরদারী, কম ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, কম কথাবার্তা বলা, অস্পষ্ট কথাবার্তা বলা ইত্যাদি অবস্থা বিরাজ করলে তা শিশুর উপর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে থাকে। পরিবারে কার কী কাজ, কী নিয়মনীতিতে পরিবার চলবে ও প্রতিদিনের নির্দিষ্ট রুটিন কী ইত্যাদি যদি স্পষ্টভাবে ও সঠিকভাবে জানানো না হয় তবে ঐ পরিবারের বাচ্চারা নিয়মমত খাওয়া-দাওয়া, ঘুমানো

খেলাধুলা প্রভৃতি থেকে বঞ্চিত হতে থাকে ফলে বাচ্চাদের মধ্যে আক্রমনাত্মকভাব, রাগারাগি, মারামারি করার প্রবণতা বেশি দেখা যায়।

অনেক সময় দেখা যায় যে অনেক পরিবারেই বাবা-মায়েরা ছেলে-মেয়ের কোন ভুল আচরণের জন্য সময়ে অসময়ে তা নিয়ে বাচ্চাকে সারাক্ষণ কটুক্তি করতে থাকে। এতে বাচ্চা শুধরে যাবার বদলে আরো বেশি করে ঐ ভুল কাজগুলি করতে থাকে। তখন বাবা-মা ও সন্তানদের মধ্যে দিন দিন সম্পর্ক খারাপ হতে থাকে। অর্থাৎ তখন দেখা যায় যে বাবা-মার কোন কথাই আর বাচ্চা শুনতে চায় না আর বাবা-মা এতে করে রেগে গিয়ে বাচ্চাকে বেশি বেশি মারধোর করতে থাকেন ফলে সমস্যা দিন দিন আরো বাড়তে থাকে। আবার এমনও দেখা গেছে যে, কিছু কিছু পরিবারের বাবা-মায়েরা সন্ত ান সঠিক কাজ করলে খুশি হয়ে তাকে মৌখিকভাবে বা কোন পুরস্কার প্রদান করে তাকে উৎসাহিত করে থাকেন। আবার যখন ভুল কাজটি করে তখন তাকে বকা দেন যেন সে শুধরে নিতে পারে, এভাবেই বাচ্চাকে সঠিক ও ভুল কাজ শিখান তারা। কিন্তু এমন অনেক বাবা-মা আছেন যারা সঠিক সময়ে সঠিক আচরণটি করেন না, ভাল কাজ করলে উৎসাহ দেন না ও খারাপ কাজ/ভুল কাজ করলে সংশোধন করেন না কিংবা হতে পারে যে ভাল কাজ ও ভুল দুই ক্ষেত্রে উৎসাহ বা বকা দিয়ে থাকেন এক্ষেত্রে বাচ্চাটি দ্বিধাদ্বন্দ্বের মধ্যে পরে যায় যে, সে আসলে কোন আচরণটি করলে বাবা-মা ও অন্যান্যরা খুশি হবে। এরকম দ্বিধাদ্বন্দ্বের মধ্যে থাকতে থাকতে তার মধ্যে মানসিকভাবে সমস্যা দেখা দিয়ে থাকে।

অনেকসময় বাচ্চার সবকাজেই বাবা-মায়েরা আগে থেকেই 'না এটা করে না, এটা করলে তোমার এটা হতে পারে' যেমন, 'বেশি দৌড় ঝাপ করবে না, ব্যাথা পাবে', 'বসে বসে খেল' বা 'কাজ করতে হবে না, বসে বসে টিভি দেখ' ইত্যাদি মন্তব্য করে থাকে। বাচ্চা যে কোন কাজ করতে গেলে বাবা মায়েরা বলে, 'তুমি এ কাজটা পারবে না, আমরা করে দিচ্ছি'। এভাবে বাচ্চাটাকে তারা কোন স্বাভাবিক কাজ কর্ম করার সাহস করতে, বা তার ইচ্ছার কোন প্রতিফলন ঘটাতে দিচ্ছেন না, ফলে বাচ্চাটি বাবা-মার উপর অতিরিক্ত নির্ভরশীল হয়ে পড়ে; কোন সিদ্ধান্ত সে নিজে নিতে পারে না ও একক প্রচেষ্টায় কাজও করতে পারে না।

আজকাল এটা প্রায়ই দেখা যায়, বাবা-মা তাদের ব্যবসা বাণিজ্য বা চাকুরি নিয়ে ব্যস্ত থাকেন এবং বাসায় আসার পরও বাচ্চার সঙ্গে তেমন একটা কথাবার্তা বলেন না বাচ্চার খোঁজখবর নেন না যে বাচ্চা সারাদিন কী করেছে, কী খেয়েছে না খেয়েছে। তারা তাদের বাচ্চাদেরকে কাজের লোকের কাছেই দিয়ে রাখে। এসব ক্ষেত্রে দেখা যায় যে বাচ্চাটির শারিরীক বৃদ্ধি ঘটছে ঠিকই কিন্তু অন্যান্য দিকের বিকাশ ঠিকমত ঘটছে না। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় সময়মত কথা বলছে না, ২/৩ বছর হয়ে গেছে তারপরও কথা বলছে না, বয়স অনুযায়ী বুদ্ধি কম থাকছে ইত্যাদি।

এছাড়াও, যেসব পরিবারে শিশু বা শিশুদের বাবাকে চাকরির প্রয়োজনে বাসার বাইরে মাসের পর মাস থাকতে হয়, কেউ মাসে একবার আসতে পারেন, আবার কেউ দেশের বাইরে থাকলে বছরে হয়ত একবার আসতে পারেন আবার নাও আসতে পারেন, এতে শিশুটি নিয়ম-শৃঙ্খলা কম মেনে চলতে চায় এবং আস্তে আস্তে তার মধ্যে বিশৃঙ্খল হবার প্রবণতা বাড়তে থাকে।

আবার এমনকি, সেসব বাবা-মায়ের মধ্যে কম আত্মবিশ্বাস, অদক্ষতা, সমস্যা সমাধান করার ক্ষমতা কম, নেতিবাচক চিন্তা করার প্রবণতা রয়েছে, তাদের বাচ্চা প্রতিপালনের ক্ষেত্রে সমস্যা দেখা যায় ও বাচ্চার উপর এগুলির প্রভাব পরে থাকে।

এছাড়াও দেখা যায়, যেসব পরিবারের সদস্য সংখ্যা বেশি কিন্তু বাসায় কক্ষ সংখ্যা সেই তুলনায় খুবই কম, সে ক্ষেত্রে এরও সরাসরি প্রভাব বাচ্চার উপরও পরে থাকে।

উপরোক্ত বিষয়গুলির প্রতি যদি বাবা-মায়েরা সচেতন হয়ে ওঠেন এবং সে অনুযায়ী বাচ্চাদের সঙ্গে যথাযথ আচরণ করার চেষ্টা করেন, তবে শিশুদের সুস্থ শারিরীক বিকাশের পাশাপাশি সুস্থ মানসিক বিকাশও নিশ্চিত করা সম্ভব।

আর এরপরও যদি সন্তানদের মধ্যে সমস্যা দেখা যায় বা যাদের সমস্যা ছিল তা আরো বেশি বৃদ্ধি পেতে থাকে, তবে মানসিক স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে যোগাযোগ করে চিকিৎসা দেয়ার ব্যবস্থা করা অতি আবশ্যক যাতে বাচ্চাটি মানসিকভাবে সুস্থ হয়ে শিক্ষাজীবনে, পরিবারে, সমাজে ও দেশের কল্যাণে নিয়োজিত হতে পারে।